

**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature &amp; Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 106 - 114

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

## প্রণয়োপাখ্যানের অন্তরমহল : মানব-মানবীর জীবনকথা

ড. অনসূয়া কুণ্ডু

প্রাক্তন গবেষক, বাংলা বিভাগ

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: [anu.k9012@gmail.com](mailto:anu.k9012@gmail.com) 0009-0007-2992-8178**Received Date 20. 01. 2026****Selection Date 10. 02. 2026****Keyword**

Medieval  
Bengali  
Literature,  
literary reader,  
Narrative,  
Amorous  
appeal, Social  
chaos, Devotion,  
Selfless love.

**Abstract**

When times change, the form of literature changes. The taste and mind of the literary reader also change. But the depth of thought or the desired emotional response never changes. The unity or combination of form with thought increases the durability of literature. Romantic love stories are the best examples of narrative style in Medieval Bengali Literature. In addition, the works of Bengali Muslim poets reveal the sweetness of the amorous appeal of human life cherished in the present era.

The dominance of biological attraction towards men and women is a part of life built on the flesh and blood of reality. The strong lust of man has never created social chaos in this type of poetry. Thanks to Indian devotion and the philosophy of happiness, it has become an ideal of love and sacrifice. The lover-lover relationship here leaves behind the form of the devotee and God, the infatuation of love, and seeks transcendental happiness. Alongside the medieval poetic works like 'Lorchandani and Satimayana', 'Yusuf Julekha', 'Padmavati', 'Laili Majnu', 'Mrigavat', 'Chandayan', 'Madhumalat', 'Vidyasundara', 'Chandravati' seem to weave the flowing life of human beings.

The central element of Bengali romance love stories written by Muslim poets is love, of course, this love is human; at its core is a pair of man and woman. Although stories centered on the love relationship between man and woman or hero and heroine gained popularity, at that time that subject was completely shrouded in the veil of religion. In this regard, we can only think of one thing - at that time, in order to resist the excessive attraction of biological needs at the center of love thoughts, the veil of religion or theory was taught on the external level of love poetry to gain a sensual form. Our task is to uncover the veil of the past and discover the formless jewel of selfless love. In today's robotic 21st century lifestyle, we must understand the attraction and power of human love and understand the importance of all kinds of achievements, including happiness and sorrow, sacrifice and patience. The result of reading medieval love stories will teach us that lesson.

## Discussion

সাহিত্য যুগ ও ধর্ম নিরপেক্ষ এক ধরনের মানসিক প্রবৃত্তিজাত শিল্পকর্ম। প্রকৃতির স্বাধীন পদচারণার মতোই প্রকৃত সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নিত্য বহমান, মানুষ যখন থেকে মনের ভাব বাঞ্ছনাকে সাহিত্যে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছে তখন থেকেই এর পথ চলা শুরু। পৃথিবীর যে কোনো কালে যে কোনো ভাষার সাহিত্যে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব পড়লেও সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে সাহিত্য হল দুর্দমনীয় মানব প্রবৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ। যদিও এই চূড়ান্ত ভাবনার অন্তর্ভবন গঠনে সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রভাব থাকে তথাপি মানবিক মনস্তত্ত্ব সাহিত্যে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রাচীনকালে মানবিক মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন ধারাগুলির যুক্তিপূর্ণ আধুনিক রূপ না দেখতে পেলেও যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে এই বিষয়টি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রাক্কালে নর-নারীর প্রেম প্রণয়ের কাহিনি রচিত হয়েছিল এবং সমগ্র মধ্যযুগ ধরে এই ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ করলে আমরা বুঝতে পারব মধ্যযুগ উত্তরকালে ধীরে ধীরে যৌনতা, ঔপনিবেশিকতা, উত্তর আধুনিকতা, নারীবাদী ভাবনা, সমকামিতা, কৃত্রিম প্রজনন এবং একক মাতৃত্ব ধারণ প্রভৃতি বহুবিধ মানবিক মনস্তত্ত্বের প্রবর্তন হয়েছে। বর্তমান বিশ্বায়ন ব্যবস্থায় মানুষের মনস্তত্ত্ব আরও জটিল ও বক্রপথে পরিচালিত হচ্ছে তবুও সেকালের বিচারে সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল প্রেম-রোমান্টিক অনুভূতি; যার সাহিত্য রূপ ধরা পড়েছিল মধ্যযুগে রচিত বাংলা প্রণয়কাব্যে।

মধ্যযুগে রচিত ধর্মনিরপেক্ষ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্যগুলি প্রায় ছয়শো বছর ব্যাপ্ত। এই বৃহৎ কালপর্বের নিরিখে রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের স্বতন্ত্রতা আবিষ্কার করা খুব সহজ কাজ নয়। বিশেষ করে সমপর্যায়ের ভাব অথবা রূপের মেলবন্ধনে এই কালপর্বের অন্তর্গত সমস্ত ধারার কাব্য রচনাগুলি মোটামুটি একই প্রকার। মধ্যযুগে রচিত রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের পাশাপাশি তখনকার রচনায় যেহেতু ন্যারেটিভ বা বর্ণনাত্মক রীতি ব্যবহার করা হত; সেহেতু প্রত্যেকটি আখ্যানকাব্যের অন্তর্গত মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের জানা প্রয়োজন—

### মধ্যযুগে প্রচলিত আখ্যানকাব্য বা ন্যারেটিভ পোয়েম

(যেগুলির মধ্যে গল্প বা গল্পের লক্ষণসমূহ বর্তমান)

১. বৈষ্ণব সাহিত্য      ২. মঙ্গলকাব্য      ৩. অনুবাদকাব্য      ৪. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

১ X ৪	এই ধারার অন্তর্গত কৃষ্ণলীলা কাব্য নাট্যগীতিমূলক। পদাবলী কাব্য লিরিক্যাল বা মেলোডিয়াস, জীবন কথাগুলি সমাজ ইতিহাসের বর্ণনা, কড়া বা তত্ত্ব গ্রন্থগুলি মননশীল যুক্তিনিষ্ঠ; অনেকটাই আধুনিক প্রবন্ধের সমতুল।	রোমান্টিক আখ্যান কাব্যগুলি মিশ্ররীতি অবলম্বনে রচিত। এর মধ্যে নাট্যলক্ষণ, গীতিলক্ষণ, লিরিক্যাল স্বভাবের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তবে এর লোকায়ত ভাবনায় মানুষের জয়গান করা হয়েছে বলে এর ভিত্তি একান্তই বাস্তব ও সামাজিক।
২ X ৪	মঙ্গলকাব্যে সমাজ বাস্তবতার ক্ষেত্রটি বস্তুনিষ্ঠ হলেও কখনোই যুক্তিনিষ্ঠ নয়, এটা কোনও ব্যক্তির জীবনকথা নয়। সমবেত নারী সমাজের আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। সেখানে ব্যক্তি নয়, সমাজ ও গোষ্ঠী প্রাধান্য পেয়েছে।	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিতে যেভাবে ধর্মের আবরণে সমাজ বাস্তবতার কথা তথা মানুষের কথা বলা হয়েছে তাতে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্য অনুসৃত হয়েছে। কেবলমাত্র মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের প্রত্যক্ষ ধর্মীয় বাতাবরণ এখানে নেই।
৩ X ৪	অনুবাদাশ্রয়ী কাব্যগুলি পূর্ব প্রচলিত প্রথার অনুসরণে মহাকাব্যিক লক্ষণাক্রান্ত। সেজন্যই এর পরিবেশন পদ্ধতিও যথার্থ ভাব গাষ্ঠীর্ষপূর্ণ।	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলি কোনও পূর্ব প্রচলিত মিথ বা প্রথার অনুসরণ করেনি। এগুলি মিশ্ররীতির রচনা বলে মহাকাব্যধর্মী নয় এবং অনুবাদাশ্রয়ী কাব্যের মতো ভাবগাষ্ঠীর্ষপূর্ণ নয়।

উপরিবর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মধ্যযুগে প্রচলিত অন্যান্য সাহিত্য ধারায় তুলনায় বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের অবস্থান সম্পর্কে অবগত হয়ে আমরা এখন দেখাব রোমান্টিক প্রণয়কাব্যের ঐতিহ্যবাহী সূত্রগুলিকে। এই বিষয়ে প্রথমে স্পষ্ট করে বলতে হয় যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান তথাপি এরও পূর্বসূত্র হিসাবে সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার অনেকটাই সাহিত্য অবদান আছে।

সংস্কৃত ভাষায় প্রেমকাব্য হিসাবে একদা জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল কালিদাসের ‘মেঘদূত’ কাব্য। ‘মেঘদূত’ যথার্থ অর্থে প্রেমের কাব্য, কেন না প্রেমের অন্যতম উপাদান যে বিরহানুভূতি তাই এই কাব্যের একমাত্র সাফল্যের চাবিকাঠি। আমরা সকলেই জানি মধ্যযুগের অপর গুরুত্বপূর্ণ শাখা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত পদাবলী কাব্যের চিরন্তন মাধুর্যের বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মির কেন্দ্রীয় দ্যুতি বিরহ বা বিপ্রলম্ব। প্রেম ও বিরহের মধ্যে যে চিরন্তন সম্পর্কের নিয়তিযোগ বিদ্যমান সে কথা বলার অতীত। সেই কারণেই প্রাচীনকালে রচিত ‘মেঘদূত’ কাব্যের বিরহ ধ্বনি এতকাল অতিক্রম করেও পাঠক হৃদয়কে মর্মমথিত ও বেদনাতুর করে তোলে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

“ন বিনা বিপ্রলম্বেন সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্নতে।

কাষয়িতে হি বজ্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্ধতে।।”<sup>১</sup> (উজ্জ্বলনীলমণি)

সেই একই কথা অর্থাৎ বিচ্ছেদ দ্বারা মিলনের পরিপুষ্টি তথা বিরহের প্রগাঢ়তায় বিচ্ছেদের তাৎপর্য বোঝাতে জন ডাইড্রেন বলেছেন—

“Love reckons hours for months, and days for years; and every little absence is an age.”

বাস্তবে এই বিচ্ছেদ অনুভূতি বিচিত্র ভঙ্গিতে রূপ লাভ করেছে ‘মেঘদূত’ কাব্যে।

‘মেঘদূত’ পরবর্তীকালে অনেকগুলি দূত কাব্য রচনা হয়েছিল যার মধ্যে অন্যতম রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি ‘ধোয়ী’ রচিত ‘পবনদূত’ কাব্যটি। রীতিগত দিক দিয়ে তিনি মহাকবি কালিদাসকে অনুসরণ করলেও কাল্পনিক বিরহ প্রণয়ের কাহিনীতে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তি লক্ষণ সেনকে নায়ক রূপে উপস্থাপন করে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছিলেন।

কাশ্মীরি কবি ‘বিলহন,’ রচিত সংস্কৃত প্রেমকাব্য ধারার অন্যতম সাহিত্য কীর্তি ‘চৌর-পঞ্চাশিকা’। পঞ্চাশটি শ্লোকে কামোদ্দীপক পরিবেশে রমণীর রূপ ও গোপন সন্তোগের চিত্র মূঢ়্য আসন্ন প্রেমবিহ্বল যুবকের স্মৃতিচারণার সূত্রে স্থান লাভ করেছে এই কাব্যে। এছাড়া ‘মাধবানল-কামকন্দলা’ নামেও একটি সংস্কৃত প্রেমকাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ‘সদুক্তিকর্গামৃত’, ‘সুভাষিত রত্নকোষ’, ‘আর্যাসপ্তশতী’ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রণয় সম্পর্কিত শ্লোকের পরিচয় মেলে। কবি ‘অমর’ রচিত ‘অমরশতক’ গ্রন্থেও দেহান্তিত প্রেমের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। এই ধারারই অন্তর্গত ‘শৃঙ্গার তিলক’, ‘শৃঙ্গার শতক’ ইত্যাদি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। এই বিপুল গ্রন্থসম্ভার মধ্যযুগের সংস্কৃত শিক্ষিত হিন্দু বাঙালি পাঠকের কাব্য বিলাসের সঙ্গী ছিল একথা বলাই বাহুল্য।

ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য রচনা ধারায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল মুসলমান কবিগণ। কিন্তু এই আগমন আকস্মিক নয়। আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতক সময়কালে নৈষ্ঠিক ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভাগ থেকে সুফী মতের উৎপত্তি। সুফী মতের উদ্ভবক্ষেত্র দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের পশ্চিমাঞ্চল, যদিও এর বিস্তার ঘটেছিল মেসোপটেমিয়ার পূর্বদিকে ইরাক, ইরান ও আফগানিস্তানে। সুফী মতো ইসলামের প্রচলিত বিশ্বাস ও আচরণকে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করে না। তাঁরা কোরাণকে ভক্তিবাদী দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করেন। বাস্তব নর-নারীর প্রেমের রূপকে সুফী কবিরা তত্ত্বকথা প্রচারের আধার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। আরবি-ফারসি কাব্যধারায় এই জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়, সময়ের সঙ্গে আরব-পারস্য দেশের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলস্বরূপ ধর্মসাধকরা ভারতে বসতি স্থাপন করে। আরবের প্রণয়মূলক কাহিনী দ্বারা পারস্যের সুফী সাধকরা অনুপ্রাণিত হয়ে ফারসি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে। গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল একাদশ শতকের কবি ফিরদৌসী রচিত ‘ইউসুফ ওয়া জোলায়খা’, একাদশ শতকের কবি আবদুর রহমান জামী, নিজামী গঞ্জভী রচিত ‘লায়লা ওয়া মজনুন’। ফারসি কবিরা এই প্রেম কাহিনীগুলিকে সুফী তত্ত্বের রূপক হিসাবে ব্যবহার করেন। নিজামী রচিত অপর একটি গ্রন্থ ‘খসরু-শিরীন’ এক বিষাদাত্মক প্রেমের আলেক্য। এছাড়া নিজামী রচিত ‘হফত পয়কর’, জামী রচিত ‘সলমন-

ওয়া অবসাল' উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলির দ্বারা বাঙালি মুসলমান কবিরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী হন।

বর্হিভারতে শুধু নয় ভারতীয় সুফীরা আরবি-ফারসি আদর্শকে সামনে রেখে হিন্দি, অওধী, অবহট্ট, রাজস্থানী, ঠেট, গোহারী প্রভৃতি ভাষায় কাব্য লেখেন। দ্বাদশ শতকের কবি আবদুর রহমান রচিত 'সংনেহয় রাসয়' গ্রন্থটি ভারতীয় সাহিত্যধারার প্রাচীন প্রণয়মূলক কাব্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। হিন্দি-অপভ্রংশে রচিত এই দূত কাব্যে কালিদাস রচিত 'মেঘদূত' কাব্যের ছায়াপাত থাকলেও কাব্যটি মৌলিক, কারণ কল্পনার মেঘ নয় বাস্তবের মনুষ্যকে এখানে দূত হিসাবে কবি চিত্রিত করেছেন। এই একই ভাষায় রচিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য আখ্যানগ্রন্থ হল চাঁদ কবির রচিত 'পৃথিরাজ রাসউ'। চতুর্দশ শতকের কবি মুন্না দাউদ 'চন্দায়ন' কাব্যটি রচনা করেন অবধী ভাষায়। এই কাব্যে স্থান পেয়েছে গৃহছাড়া প্রেম। প্রেম যে ঈশ্বরের সৌন্দর্যের প্রকাশ এই মূল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে এখানে। কবি কুতবন রচিত 'মৃগাবত' কাব্যে লোককাহিনীর আশ্রয়ে প্রেমের চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া কবি দামো রচিত 'লক্ষণ সেন-পদ্মাবতী কথা', উসমান রচিত 'চিত্রাবত', মালিক মোহাম্মদ জায়সী রচিত বিখ্যাত রোমান্টিক হিন্দিকাব্য 'পদমাবত', কবি মনবান রচিত 'মধুমালত' অবিস্মরণীয় সাহিত্য কীর্তি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি হিসাবে খ্যাত শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' আখ্যানকাব্যটির কাহিনি অতি প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে মহাপুরুষ যোশেফের গল্পে, পবিত্র কোরাণের 'সুরা ইউসুফ' অধ্যায়ে ইউসুফ নবীর কাহিনিতে, পারস্য কবি আবুল কাশিম ফেরদৌস রচিত কাব্যে, জামী রচিত ফারসি কাব্যে, ইমাম গাজ্জালী রচিত 'তফসীর' গ্রন্থে সর্বত্রই 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যের উপাখ্যান আছে। তবে বাঙালি লেখক সরাসরি কোনো কাব্যের অনুসৃতি না করে মৌলিকতা প্রদান করেছেন কাহিনির বয়ানে। প্রাকৃতিক এবং লোকজ উপাদান ব্যবহারে তাঁদের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছেন।

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার জনপ্রিয় কবি দৌলত উজির বাহারাম খাঁ রচিত প্রবাদ প্রতিম প্রণয় কাহিনি 'লায়লী মজনু' কাব্যের আখ্যানভাগে কোথাও কাব্যকাহিনির উৎসের ইঙ্গিত নেই। কাহিনির ঘটনাস্থান ও পাত্র-পাত্রী আরবীয় হলেও আরবি সাহিত্যে এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো গ্রন্থের প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায় না। মনে করা হয় আরবের লোককথাই এর উৎস।

মধুর প্রেমের অপরূপ চিত্রমণ্ডিত 'মধুমালতী' কাব্যটির উপাখ্যানের উপাদান দেশীয় সাহিত্য। হিন্দি ও ফারসি ভাষার প্রায় একগুচ্ছ কবি এই প্রণয়গল্প নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। ষোড়শ শতকের উল্লেখযোগ্য কবি মনবান কৃত এই কাব্যের বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন সাতজন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মুহম্মদ কবীর। মূল ঘটনাধারা অনুসরণ করলেও তাঁর কাহিনি আক্ষরিক অনুবাদের পরিবর্তে উঠেছে যথার্থ ভাবানুবাদ। শাহ বারিদ খান রচিত 'হানিফা-কয়রাপরী' গ্রন্থটি জঙ্গনামাধর্মী কাব্য হলেও রোমান্সের প্রাধান্যও একই সঙ্গে চিত্রিত, এই কাব্যের পাণ্ডুলিপি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাওয়ায় কাহিনির আদি উৎস জানা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে যে সমস্ত মুসলমান কবি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন তাদের মধ্যে শাহ বারিদ খান রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনিটি উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীর কবি বিলহন রচিত সংস্কৃত কাব্য 'চৌর-পঞ্চশিকা' এই কাব্যের আদি উৎস বলে বিদগ্ধ পণ্ডিত মহলে মনে করা হয়। রাজপুত্র সয়ফুল ও পরী রাজকন্যা বদিউজ্জামালের প্রেমকাহিনি অবলম্বনে রচিত 'সয়ফুলমলুক বদিউজ্জামাল' নামক কাব্যটি বাংলা ভাষায় যে চার জন কবি রচনা করেছিলেন তাদের মধ্যে দোনা গাজী প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়। এই কাহিনির উৎস আরবি 'আলেফ-লায়লা' গ্রন্থ। ফারসি ভাষায় ভারতীয় কবি মহাফিল এই কাহিনি লিখেছিলেন। এই কাহিনির সর্বোৎকৃষ্ট বাংলায় অনুবাদ করেন সৈয়দ আলাওল।

দৌলত কাজী রচিত 'লোর-চন্দ্রানী-সতীময়না' কাব্যের কাহিনি মৌলিক সৃষ্টি নয়। বিভিন্ন লোককথা এর উৎস। তবে প্রধানত পঞ্চদশ শতকের কবি মিঞা সাধন রচিত হিন্দি 'মৈনাসৎ' কাব্য এবং চতুর্দশ শতকের কবি মুন্না দাউদ রচিত 'চন্দায়ন' কাব্য থেকে কবি কাহিনি সূত্র সংগ্রহ করেছেন। কাহিনির শেষাংশ সৈয়দ আলাওল কর্তৃক রচিত।

প্রসিদ্ধ হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত 'পদমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ স্বরূপ সৈয়দ আলাওল রচনা করেন বিশিষ্ট কাব্য 'পদ্মাবতী'। আলাওল মূল কাহিনির পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন, বিয়োজনের মাধ্যমে নিজস্ব মৌলিকতার

পরিচয় দিয়েছেন। সৈয়দ আলাওল রচিত অন্যতম রোমান্সধর্মী কাব্য ‘সপ্ত পয়কর’। পারসিক কবি নিজামী গঞ্জভী রচিত ফারসি কাব্য ‘হফত পয়কর’ থেকে মৌলিক অনুবাদ করেছেন। আরাকান রাজসভার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত কোরেশী মগন ঠাকুর রচিত ‘চন্দ্রাবতী’ কাব্যের পূর্ণাঙ্গ লিপি পাওয়া না যাওয়ায় এই বিষয়ক সঠিক উৎস গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। গল্পের কাঠামো বিশ্লেষণ করে মনে করা হয় একটি মাত্র গ্রন্থ এর উৎস নয়। দেশীয় রূপকথা ও ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে বিদেশি পুরাণের মিথ মিশ্রণ করে বীরভান ও চন্দ্রাবতীর প্রেমকথা রচিত হয়েছে। আবদুল হাকিম রচিত ‘লালমতি-সয়মুলুক’ নামক কাব্যটি বাংলা প্রণয়োপাখ্যানধর্মী সাহিত্য ভাণ্ডারের এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে ফারসি গ্রন্থ ‘সিকান্দারনামা’ গ্রন্থের সাদৃশ্য থাকলেও মনে করা হয় মূল কাহিনি উৎস অজ্ঞাত কোনো লোককাহিনি। ঈশ্বরদত্ত কবিত্বশক্তির অধিকারী কবি নওয়াজিস খান রচিত ‘গুলে বকাওলী’ নামক প্রেমোপাখ্যানকাব্যটির পুঁথি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাওয়ায় আনুমানিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং কাহিনির সাদৃশ্যতার কারণে মনে করা হয় ভারতীয় কবি শেখ ইজ্জতুল্লাহ রচিত ফারসি গ্রন্থ এর উৎসগ্রন্থ। কাহিনির জনপ্রিয়তার কারণে পরবর্তীকালে অনেক কবিগণ গদ্যে ও পদ্যে এই আখ্যান গ্রন্থ রচনা করেছেন।

‘শাহজালাল-মধুমালা’ নামক প্রণয়কাব্যের রচয়িতা মঙ্গলচাঁদ। কবির নাম হিন্দু ভাবাশ্রয়ী হলেও কাব্যে কবি প্রদত্ত সামান্য পরিচয় থেকে জানা যায় যে তিনি জাতিতে মুসলমান। সয়্যিদ সুলতান ও মুহম্মদ খান রচিত কাব্য অনুসরণ করে গ্রন্থটি লিখিত। পাঁচালির ঢঙে লেখা এই কাব্যে প্রেমকাহিনির পাশে ইসলামি তত্ত্বকথাও স্থান পেয়েছে। ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত কবি সয়্যিদ আকবর রচিত কাব্য ‘জেবলমুল্ক-শামারুখ’ যক্ষকন্যা ও রাজপুত্রের রোমান্টিক প্রেমের আলোচ্যে নির্বাচনে তিনি পূর্ববর্তী কবিগণের রচিত অতিলৌকিক ঘটনা ধারাকে নির্বাচন করেছেন। রচনারীতিতে কবি আলাওল-এর প্রভাব লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ‘মৃগাবতী’ কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ মুকীম। রচিত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। কুতবন রচিত হিন্দি অবধী গ্রন্থ ‘মৃগাবত’ কাব্য এই গ্রন্থের আদর্শ বলে মনে করা হয়। শেখ সাদী রচিত কাব্য ‘গদামল্লিকা’ অপর এক রোমান্সধর্মী সাহিত্যের নিদর্শন। ধর্মতত্ত্বমূলক হাজারটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে আবদুল্লা নামের এক ফকির রাজকুমারী মল্লিকাকে লাভ করেছিল। এই ধরনের গ্রন্থ পূর্বে শেখ সেরবাজ চৌধুরী রচনা করেছিলেন।

মুসলমান কবিদের লেখা বাংলা রোমান্স প্রণয়োপাখ্যানের কেন্দ্রীয় উপাদান তথা ‘Common feature’ হল প্রেম, অবশ্য এই প্রেম মানবিক; যার মূলে একজোড়া নর-নারী অবস্থিত। নর-নারী বা নায়ক-নায়িকার প্রেম সম্পর্কে কেন্দ্র করে কাহিনি জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তৎকালে ধর্মের আবরণে সেই বিষয়কে সম্পূর্ণ মুড়ে রাখা হতো। এক্ষেত্রে আমাদের একটা কথাই মনে হয়— তৎকালে প্রেম ভাবনার কেন্দ্রস্থলে জৈব চাহিদার অত্যধিক আকর্ষণকে প্রতিরোধ করে তাকে ইন্দ্রিয়োধ রূপ লাভের জন্য প্রেম-কাব্যের বাহ্যিক স্তরে ধর্ম বা তত্ত্বের আবরণ পড়ানো হয়েছিল। এই বিষয়ে মধ্যযুগে রচিত সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তত্ত্ব গ্রন্থের অন্তর্গত একটি জনপ্রিয় উক্তি স্মরণযোগ্য—

“কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।

লৌহ আর হৈম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।

কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।।”<sup>২</sup>

প্রেমভাবনার পাশাপাশি কামভাবনা তথা যৌনতার সমান্তরাল উপস্থিতি তৎকালে বিদ্যমান ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদেও প্রেম ও কামের সমন্বয়কে ধর্মের মোড়কে পরিবেশন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যেও এই বিষয়ের পরিপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ করা যায় রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয় সম্পর্কের মাধ্যমে। রাধার প্রেমে অপার্থিব আকর্ষণের সূচককে ভক্তের দুর্নিবার আকৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে অথচ স্বামীর দ্বারা জৈবসুখে বঞ্চিতা সমৃদ্ধ যৌবনবতী নারীর হাহাকারে তীব্র কামের উপস্থিতি অনস্বীকার্য। কৃষ্ণকে কামনা করে রাধা বলেছেন—

“বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।

মোর মন পোড়ে যেহু কুস্তারের পণী।।”<sup>৩</sup>

কৃষ্ণের প্রতি রাধার আকৃতিতে একাধিক স্থানে দেহকেন্দ্রিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই দেহ-কেন্দ্রিকতার সামাজিক প্রাদুর্ভাবকে প্রতিরোধ করার জন্য হয়তো তৎকালে বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যকারদের হাতে ধর্মীয় আবরণ সামাজিক রক্ষাকবচ রূপে প্রযুক্ত হয়েছিল। মধ্যযুগে রচিত প্রেম-রোমান্টিক উপাখ্যানের সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর স্বেচ্ছাচারিতার তুল্যমূল্য বিচার করে, আজ একান্তই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় আমাদের বর্তমান নিবন্ধের বিষয়টি। বিশেষ করে এই একুশ শতকের অস্থির সময়পর্বে অন্তর্জালের স্বাধীন পদচারণার মধ্যে দিয়ে নর-নারীর জৈব চাহিদার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি তাদেরকে আরও উদ্ধত ও বেপরোয়া করে তুলছে। সমাজপতিরাও সকলেই আজ নিরুপায়। কারণ কাম প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য আজ কোনও ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক আবরণ প্রয়োগ করা যায় না। অথচ মধ্যযুগে প্রেম ও কামের সুতীর সমান্তরাল উপস্থিতি ছিল; পাশাপাশি সমাজে অবস্থিত সাধারণ নর-নারীর মধ্যে সুস্থ সম্পর্কের পরিকাঠামোটিও নিয়ন্ত্রিত হত। তৎকালে রচিত সাহিত্যকারদের মধ্যে অবাঙালি মুসলিম কবিদের রচনাতেও উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রেমের রক্ষাকবচ রূপে ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ করা যেত।

প্রধানত আরবি-ফারসি সাহিত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত বাঙালি মুসলিম কবিদের সৃষ্ট প্রণয়োপাখ্যানগুলিতে পারস্যে প্রচলিত সুফীতত্ত্বের মূলসূত্র দেহোত্তর প্রেমের ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রকৃত প্রেম মিলনে নয়, বিরহেই যথার্থ সার্থকতা পায়। সহিষ্ণুতা প্রেমের মূল তপস্যা যা মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলে। সেজন্যই দেবতাদের মাহাত্ম্যকে পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব কবি ‘চণ্ডীদাস’-এর মতো সুউচ্চ কণ্ঠে মুসলিম কবিরাও মানবসত্যের এই বাণীকে মেনে নিয়েছেন—

“সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।”<sup>৪</sup>

আমাদের আলোচনার সর্গক্ষিপ্ত পরিসরে জনপ্রিয় রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলি থেকে প্রেম ও ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা যাক—

পঞ্চদশ শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ‘ইউসুফ-জোলেখা’ কাব্যটি মর্ত্যলোকের মানব-মানবীর প্রেমকাহিনি অবলম্বনে রচিত হলেও এখানে রূপকার্থে সুফী ধর্মের প্রভাব লক্ষণীয়। কাব্যের শুরুতে কবি ধর্মীয় চেতনার কথা উল্লেখ করেছেন—

“পুরাণ কোরাণ মধ্যে দেখিলু বিশেষ।

ইছুফ জলিখা বাণী অমৃত অশেষ।।”<sup>৫</sup>

তিনি জীবাত্তা পরমাত্মাকে ইউসুফ জোলেখার রূপকে ব্যক্ত করেছেন। জোলেখা শক্তি, দম্ভ, সম্ভোগ তথা ষড়রিপু দ্বারা চালিত হয়ে প্রেমিক ইউসুফকে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু কাব্যে শুধু ধর্মভাবনা নয় রোমান্টিকতার চরম নিদর্শন স্বরূপ নারী সৌন্দর্যকেও সুচারু ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়েছে। কাব্যে কবি বিস্তারিতভাবে নারীর দেহসৌন্দর্যের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপামাত্মক উল্লাসের চিত্র, দেহজ কামনার চিত্র এঁকে যথার্থ মানববাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিণাম দিয়েছেন। এখানে সুফী ধর্মের আবরণ ছিন্ন করে যুগ ও কালের চিরন্তন নারী সৌন্দর্যের প্রতীক ধরা পড়েছে পুরুষের চোখে। এই অংশের বর্ণনা এক অর্থে যথার্থ বাস্তবিক এবং আকর্ষণীয়।

এই গ্রন্থে ধর্ম ও প্রেম এক সঙ্গে পথ চলতে গিয়ে কোথাও কোথাও প্রেমের রূপ-তৃষ্ণা-মোহ চরম রূপ ধারণ করলেও আবার ইন্ডিয়োর্ণ অনুভূতির তাড়নায় অবাধ্য প্রেমতৃষ্ণা মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছে। ঈশ্বর প্রাপ্তির পথ যেহেতু সমগ্র ইন্ডিয় বাসনার উর্ধ্বে তাই জোলেখা ইউসুফ প্রাপ্তির পথে প্রেম, বিরহ, অনুতাপের মধ্যে দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়েছে। জোলেখার মতো বাস্তব নারী চরিত্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ কারণ নিজের প্রেমকে লাভ করবার জন্য সমাজ, সংস্কার, পাপ, পুণ্যকে সে তুচ্ছ করে দিয়েছে।

ষোড়শ শতকের জনপ্রিয় কবি দৌলত উজির বাহারাম খান রচিত ‘লায়লী-মজনু’ আখ্যানকাব্যটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অমর প্রেমকাহিনির মধ্যে অন্যতম। ব্যর্থ প্রেমের আলেখ্য স্বরূপ এই কাব্যটি জনসমাজে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এই কাব্যে কোনো ধর্মীয় প্রভাব প্রাধান্য পায়নি, পরিবর্তে স্থান পেয়েছে লায়লী ও প্রেমে উন্মাদ মজনুর অমোঘ আকর্ষণ এবং ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে বিষাদময় পরিণতি। তাদের উভয়ের মধ্যে প্রেম অলৌকিকতা বর্জিত, বাস্তব জীবন নির্ভর ও মানবিক। তাই দুজনেই প্রেমের অপার্থিব অনুভবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে—

“যাবৎ জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ  
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ।”<sup>৬</sup>

প্রখ্যাত সমালোচক ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক এই কাব্যের ভাববস্তু সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন—

“এ কাব্যে নায়ক-নায়িকা উন্মাদ হইলেও যৌন-প্রেরণা চপল নহেন; সেইজন্য তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল নহেন। ইহারা সমাজ-শাসন মানেন, গুরুজন স্বীকার করেন, ধর্মের বিধিনিষেধ অনুসরণ করেন, অথচ পরস্পরের আকর্ষণে পাগল। ধর্ম সমাজ, গুরুজন, স্বীকার করেন বলিয়াই লায়লী ও মজনুর মধ্যে মিলন হইয়াও হয় নাই।”<sup>৭</sup>

মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাবরণে অলৌকিকতা মুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ, মানব প্রেমের জয়গান স্বরূপ কাব্যটি স্বীকৃতি পেলেও কাব্যটির অন্তরে সুফীধর্মের ফল্গুধারা কিঞ্চিৎ মাত্রায় প্রবাহমান ছিল। এই প্রসঙ্গে সমালোচক ‘ওয়াকিল আহমেদ’ বলেছেন—

“লায়লী-মজনু কাব্যের মৌলিক বিষয়বস্তু প্রেম। এ প্রেমের একটি ধারা লৌকিকতার দিকে, অপর ধারা আধ্যাত্মিকতার দিকে প্রবাহিত। বাহার্থে যা মানবিক বা লৌকিক প্রেম, রূপকার্থে তাই ঐশী বা আধ্যাত্মিক প্রেম। দৌলত উজির বাহরাম খান কাব্যে বর্ণনার গুণে উভয় প্রেমকে সাস্থীকৃত করেছেন।”<sup>৮</sup>

কাব্যটিতে সুফী সাধনার কথা বেশ সরাসরি বলা হয়েছে—

“ভাব বিনে প্রেম নাহি প্রেম বিনে রস।  
ভাব অনুরূপ সিদ্ধি পুরএ মনস।।”<sup>৯</sup>

শ্রেষ্ঠ বাঙালি মুসলমান কবি দৌলত কাজী রচিত ‘লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না’ কাব্যটির কাহিনি মানবিক প্রেম ও রোমাঞ্চ রসে পরিপূর্ণ। বিবাহিত নর-নারীর পরকীয়া প্রেমের যে চিত্র এখানে উপস্থিত তা কখনোই অতিরঞ্জিত নয়, বরং অনেকাংশে মনস্তাত্ত্বিক, স্বামী দ্বারা যৌবনসুখে বঞ্চিতা স্বাধীনতা, আধুনিকমনস্কা চন্দ্রানীর পক্ষে পরপুরুষ রাজা লোরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কাব্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে সুফী ধর্মের প্রভাব থাকলেও মূল কাহিনি সুফী ভাবনার দ্বারা পরিচালিত নয়। কাহিনি অংশে লোর ও চন্দ্রানীর মিলন প্রসঙ্গে দেহজ কামনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ আদিরস ও শৃঙ্গার রসের বিশেষ পরিবেশনা রয়েছে—

“প্রথমে মদন কেলি ঘন আলিঙ্গন।  
কামতাপে ভয় লজ্জা ধৈর্য পলায়ন।।  
দন্তে দন্তে ঘরিষণ বদনে বদন।  
পুলকে পুলক তনু সমন চুষন।।”<sup>১০</sup>

কিন্তু কবি সুদক্ষ প্রতিভার জাদুকারি স্পর্শে কাব্যের শালীনতার সীমা রক্ষা করে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে মানবীয় প্রেমকে বড় করে তুলেছেন। দেহের মধ্যেই দেহাতীতের সন্ধান করেছেন কবি—

“নিরঞ্জন সৃষ্টি নর রতন অমূল।  
ত্রিভুবনে কেহ নাহি নর সমতুল।।  
নর সে পরম তন্ত্রমন্ত্র তত্ত্বজ্ঞান।  
নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরাণ।।”<sup>১১</sup>

কাব্যের অপর নায়িকা ময়না নিজেকে সমস্ত প্রলোভনের হাত থেকে শুদ্ধ রেখে ঈশ্বর প্রাপ্তির কঠিন পথে স্বামী লোরের জন্য অপেক্ষা করেছে। সুফী তত্ত্ব অনুসারে আশিককে পাওয়ার জন্য মাশুককে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। মানবিক প্রেম হয়েও এই আখ্যান মানবপ্রেমের উর্ধ্বে অবস্থিত। সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কাহিনির মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশন রীতির ভূয়সী প্রশংসা করে যথার্থই বলেছেন—

“দৌলত কাজীই মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্ত্য-জীবনরসের কবি।”<sup>১২</sup>

আরাকান রাজসভার সভাকবি সৈয়দ আলাওল রচিত ‘পদ্মাবতী’ কাব্যটি আদ্যন্ত রোমান্টিক রসে জারিত। কাব্যটি ধর্মীয় প্রভাব মুক্ত। মানবিক প্রেমের পাশাপাশি রত্নসেন-পদ্মাবতীর বাসার মিলন চিত্রে শৃঙ্গার রসের উদ্দামতা বর্তমান। সমালোচক ওয়ালিক আহমেদ এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

“আলাওলের বর্ণনায় স্নায়ুপীড়াকর নগ্নতা আছে।”<sup>১৩</sup>

কবি মর্তলোকের রূপ-রস-গন্ধকে আকর্ষণ করে আস্বাদ করেছেন এই কাব্যে। স্তুতিখণ্ডে, সৃষ্টিতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব, সুফী প্রেমতত্ত্ব আলোচিত হলেও কাব্যটির প্রধান সুর—

“প্রেম বিনু ভাব নাহি ভাব বিনু রস।

ত্রিভুবনে যথ দেখ প্রেম হস্তে বশ।।”<sup>১৪</sup>

বাংলা প্রেম-রোমান্টিক আখ্যানধারার কাহিনিগুলিতে মুসলমান কবিদের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলস্বরূপ হিন্দু দেব-দেবীর পরিচয়, হিন্দু রাজাকে নায়ক হিসাবে চিত্রায়ন, হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি, তত্ত্বের বিপুল নিদর্শন পাওয়া যায়, যা সত্যই ধর্মনিরপেক্ষ উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় জ্ঞাপক। সব থেকে বড় কথা হল, গৌড়, সিলেট, চটিগাঁ, কাছাড়, রোসাঙ্গ, কামতা- কামরূপ, শ্রীহট্ট-ত্রিপুরা, মল্লভূম-খলভূম, প্রভৃতি বিস্তৃত বাংলা প্রদেশে রোমান্টিক প্রণয়োখ্যানের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষের মাটিতে এই বীজ নিষিক্ত হয়েছিল- কবি জয়দেবের হাত ধরে, বিদ্যাপতির কাব্য ধারাকে সঙ্গী করে, ভারতচন্দ্রের দুঃসাহসিক শিল্প সাধনা সৃষ্টির মাধ্যমে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়ের কাহিনিকাব্য বিদ্যাসুন্দর। বাংলায় হিন্দি ফারসি রোমান্টিক কাব্যধারার ভগিরথ রোসাঙ্গ দরবারের দুই জন সভাকবি দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। আরবি-ফারসি ভাষা সাহিত্যের অন্তর্গত সুফী মতাদর্শবলম্বী প্রেম ও ভক্তিযোগের সঙ্গে ভারতীয় প্রেমাদর্শের অন্তর্গত ধ্যান ও যোগদর্শন মিলেমিশে একাকার হয়ে রূপকাশ্রয়ী প্রেমকাব্য প্রণয়োপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত প্রেম কাব্যের অন্তর্গত মূল বিষয় হল মান-মানবীর হৃদয়ের দুর্দমনীয় জৈবিক আকর্ষণ। বাস্তবের চাওয়া-পাওয়া কেন্দ্রিক প্রবল আসক্তি সেখানে প্রকট হলেও - ধর্মতত্ত্বের বাতাবরণে অধ্যাত্মসাধনার নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনের অভিমুখে সুফী মতবাদের পরিপোষক রূপক তত্ত্বই (allegory) এখানে প্রধান।

‘লায়লী মজনু’ এক্ষেত্রে একটি অন্যতম উদাহরণ হতে পারে। ‘দুই তনু একই পরাণি’ কাব্যংশে অভেদ-আত্মার অনুভূতি আছে। লায়লী ও মজনু একই আত্মার দুটি মরদেহের আধারে বাহ্যিক বিকাশ মাত্র। দেহের বন্ধনে বিচ্ছেদের ব্যবধান এসেছে। মিলন একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাদের প্রেম সম্পর্ক নতুন বা আকস্মিক ব্যাপার নয়, চিরকালের অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িত। প্রেম সত্য, আর সব অনিত্য। লায়লী বলেছে—

“জীবন যৌবন মোর তন মন হিয়া।

প্রেমভাবে হারাইলুঁ তোমাকে দেখিয়া।।”<sup>১৫</sup>

বাস্তবের আনন্দ-আশ্রয়, প্রেম-বিরহ বেদনার প্রতিচ্ছবি এই কাব্যের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান। দেহজ প্রেম বাসনার প্রবল আকর্ষণে নর-নারীর দুটি হৃদয় যখন একাত্ম হওয়ার জন্য উদ্গীব তখনই আকস্মিক বিচ্ছেদ এসে প্রেম প্রাপ্তির অন্তরায় হয়ে ওঠে। মানব হৃদয়ে প্রেমিক সত্তার বেদনাশ্রু ও সংযমী অপেক্ষা ঈশ্বর বা পরমাত্মার প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। একমাত্র ঈশ্বরপ্রাপ্তিই যেমন সুফী সাধনার চরম প্রাপ্তি বা আনন্দ বলে ধরা হয়, তেমনই ভাবে সমস্ত ভবিতব্যের শেষে প্রেমিক-প্রেমিকার একে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করে আনন্দ বা মুক্তি লাভ করে। অন্তরের পূর্ণ সত্তাকে অনুভব করে দৈনন্দিন অহং কেন্দ্রিক ভোগলিপ্সার জগৎকে অস্বীকার করে আনন্দ, প্রজ্ঞা ও প্রেমের রাজ্যে বাস করাই একজন সুফীর আকাঙ্ক্ষা। ‘লায়লী মজনু’ কাব্যের অন্তিম পরিণতি আমাদের এই কথাগুলিই স্মরণ করায়।

ঐশী প্রেমের দেহজ আকর্ষণ বড় হলেও, মধ্যযুগে মুসলমান লেখকদের বাংলা লেখায় সুফীবাদ এবং শ্রী চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিবাদ; বাঙালি সংস্কৃতির মর্মস্থলে সদা বিরাজমান। প্রণয়োপাখ্যানে বর্ণিত মানব-মানবীর চিরন্তন আকর্ষণের প্রতীতি; ভালোবাসার সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ। যার আলো কখনোই একেবারে নিভে যেতে পারে না। বর্তমানে একুশ শতকের শঠতা ও হিংসার বাতাবরণে মানব প্রেমের হারানো মূলধনকে খুঁজে পেতে গেলে রোমান্টিক কাব্যের অন্দরমহলে অনুপ্রবেশ করে প্রেম রস সুধা পান করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একদা বাংলার পূর্ব প্রদেশে সৃষ্ট আরাকান দরবারের

প্রণয়োপাখ্যান কাব্যের প্রেম-মাধুর্য, ভালোবাসার অপার শক্তির নিগূঢ় রহস্য উন্মোচনের মধ্যে থেকেই উদার ও মানবতাবাদী সাহিত্যবোধের জন্ম নেবে; এই আশা আমরা রাখি।

### Reference:

১. গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণ, 'উজ্জ্বলনীলমণি', শ্রী রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন (অনুবাদক), তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, পুনঃ মুদ্রিত, আশ্বিন ১৪২১, পৃ. ৬০
২. কবিরাজ, কৃষ্ণদাস, 'শ্রীশ্রী চৈতন্যচরিতামৃত', সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ বৈশাখ ১৪০২, পৃ. ২৫
৩. চণ্ডীদাস, বড়ু, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পাদক), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ত্রয়োদশ সংস্করণ মাঘ ১৪১৭, পৃ. ৩৮০
৪. মজুমদার, বিমানবিহারী, 'চণ্ডীদাসের পদাবলী', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ ১৩৬৭, পৃ. ২৮০
৫. হক, এনামুল (সম্পাদিত), 'ইউসুফ জোলেখা', মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৯, পৃ. ১১৬
৬. শরীফ, আহমদ (সম্পাদিত), 'লায়লী মজনু', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৯৭
৭. বহরাম খান, কবি দৌলত উজীর, 'মাসিক মোহাম্মদী', মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৪ সন, পৃ. ৯
৮. আহমেদ, ওয়াকিল, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, নবম সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১৫৮
৯. শরীফ, আহমদ (সম্পাদিত), 'লায়লী মজনু', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৩৫
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত), 'লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ২০১০, পৃ. ৬৭
১১. তদেব, পৃ. ৯
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড: প্রথম পর্ব)', মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃ. ৪৬৫
১৩. আহমেদ, ওয়াকিল, 'বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান', খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, নবম সংস্করণ ২০১২, পৃ. ৩১৭
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পাদিত), 'পদ্মাবতী', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০২, পৃ. ২৩
১৫. শরীফ, আহমদ (সম্পাদিত), 'লায়লী মজনু', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৯৬